নারীবাদ ও কবিতা সিংহের কবিতা

অভিজিৎ পাল

ধনতান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার অধঃপতন ঘটতে থাকে এবং ধীরে ধীরে নারীকে অন্তরালে চলে যেতে হয়। ক্ষমতার রাশ সম্পূর্ণভাবে পুরুষের হাতে চলে আসায় নারীর ওপর নেমে আসে অভিঘাত। কিন্তু যেখানেই থাকে পীড়ন সেখানেই ধীরে ধীরে জন্ম নেয় প্রতিবাদ। সমাজের গভীরে নারীর ক্ষোভ যন্ত্রণা ভাষাহীন অন্ধকার ছেড়ে উচ্চারণের আলোয় প্রকাশিত হতে শুরু করে। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে এর থেকেই ক্রমশ আলোড়নের ঢেউ সৃষ্টি হয়, জন্ম নেয় নারীবাদ।

নারীবাদ বিংশ শতাব্দীতে তৈরি হওয়া একটি দর্শন বা চেতনা, যা আধুনিক সভ্যতায় মানুষ হিসেবে পুরুষের তুলনায় সবদিক থেকে সব অর্থে নারীর সমান ক্ষমতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। নারীবাদ সভ্য সুস্থ সমাজে নারীর সমতার দাবি করে। নারীবাদ সর্বার্থে পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের যৌক্তিকতার ওপর গুরুত্ব দেয়। নারীবাদ ঘোষণা করতে চায়, নারীরা পুরুষের সমান সক্ষম, সভ্য সমাজে সামাজিক অবদানের দিক দিয়েও নারীরা পুরুষের থেকে কোনো অংশে কম নয়। এই নারীবাদকে তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক রূপ দেওয়ার প্রয়াস থেকে জন্ম নিয়েছে নারীবাদী তত্ত্ব। নৃবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, উইমেন স্টাডিজ, নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা, শিল্প, ইতিহাস, মনোসমীক্ষণ এবং দর্শন প্রভৃতি বিষয়কে ঘিরে নারীবাদ প্রসারিত হয়েছে। নারীবাদী তত্ত্ব লিঙ্গবৈষম্যকে বোঝার চেষ্টা করে এবং জেন্ডার রাজনীতি, ক্ষমতার সম্পর্ক ও যৌন আবেদন প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে। এই ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জটিল সম্পর্কগুলি ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি নারীবাদী তত্ত্ব নারীদের অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়।

১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপীয় সমাজবাদী ও দার্শনিক চার্লস ফুরিয়ে প্রথম 'নারীবাদ' শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন। 'নারীবাদ (feminism) এবং 'নারীবাদী' (feminist) শব্দ দুটি ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসে প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮৭২-এ, যুক্তরাজ্যে ১৮৯০-এ, এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৯০-এ, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১০-এ। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান অনুযায়ী 'নারীবাদী' শব্দের উৎপত্তিকাল ১৮৫২ এবং 'নারীবাদ' শব্দের ক্ষেত্রে তা ১৮৯৫ ধরা হয়েছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য নারীবাদী আন্দোলনের ইতিহাস তিনটি পর্যায়ে বা ধাপে বিভক্ত। নির্দিষ্ট কিছু নারীবাদী লক্ষ্যের এক একটি আঙ্গিক নিয়ে এক একটি ধাপ কাজ করেছে। প্রথম ধাপের কেন্দ্রে রয়েছে সময়, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রিটেনে নারীর ভোটাধিকার অর্জনের উপর জোর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ধাপে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৯৬০-এর দশকে নারীমুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হওয়া মতাদর্শ ও কর্মসূচিসমূহকে চিহ্নিত করা হয়। এই পর্যায়ে এসে নারীর সামাজিক ও আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছিল। ফরাসী দার্শনিক সিমোন দ্য বুভ্যুয়া ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'সেকেন্ড সেক্স' (দ্বিতীয় লিঙ্গ) গ্রন্থটি নারীবাদের স্রোতকে পরিপুষ্ট করে তোলে। এই গ্রন্থে তিনি বলেন, 'কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজই মানুষকে নারী করে তোলে!' এই বইয়ে নারীবাদের অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান মার্কসীয় বস্তুবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নারীবাদের দ্বিতীয় ধাপে নারীবাদ নারীর

ভোটাধিকার পরবর্তী অন্যান্য অধিকার যেমন জেন্ডার অসমতা নিয়ে কাজ করে। এছাড়াও এসময় সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অসমতা দূরীকরণে কাজ করা হয়। এই পর্যায়ে ইউরোপীয় মহিলা ঔপন্যাসিকগণের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। শোয়ালটের 'এ লিটারেচার অফ দেয়ার ওন' (A literature of their own), মিলেটের 'সেক্সুয়াল পলিটিক্স' (sexual politics), হেলেন সিক্সোর 'দ্য লাফ অফ দা মেড়সা' (The laugh of the Medusa) পাশ্চাত্যের নারীবাদকে পরিপুষ্ট করে। নারীবাদের অভিযাত্রার তৃতীয় ধাপ হল দ্বিতীয় ধাপেরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৯৯০-এর দশক থেকে শুরু হওয়া একটি ভিন্ন অভিমুখী ধারাবাহিকতা। এই পর্বে কিছু স্বতন্ত্রতা দেখা যেতে থাকে। যেমন সেক্সুয়ালিটি, নারীদের হেটের সেক্সুয়ালিটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা, এমনকি সেক্সুয়ালিটিকে নারীদের ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরা হয়। অর্থাৎ নারীবাদের অভিমুখ সময়ের সঙ্গে একাধিকবার পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে ব্যাপ্ত রূপ নিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্থে তাত্ত্বিক নারীবাদের বার্তা এসে পৌঁছয় প্রাচ্যের দেশগুলিতে। ভারতে তথা বাংলাতেও এই সময়ে নারীবাদ প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায়। যদিও বাংলার প্রথম নারীবাদী লেখিকা চন্দ্রাবতী দেবী, যিনি বাংলার মধ্যযুগ সময়পর্বেই রামায়ণ মহাকাব্যের নায়িকা সীতা দেবীর দৃষ্টিতে (অর্থাৎ একনারীর দৃষ্টিতে) রামায়ণকে নতুনভাবে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা সাহিত্যিকদের লেখায় উৎকীর্ণ নারীবাদের ধ্বনি শোনা যায়নি, কিন্তু এই পর্বেই বাংলায় নারীদের কথা নারীরাই লিখতে শুরু করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে নারীবাদ স্পষ্ট রূপ নিতে শুরু করে—

১। নারীরা পুরুষের সঙ্গিনী পরিচয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে, পুরুষের যৌনপুত্তলিকা হিসেবে মেনে নিতে না চেয়ে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মূল দৃষ্টিকোণকে প্রত্যাখ্যান করতে সাহস দেখায়।

২। পুরুষ নারীকে দেবী রূপে বন্দনা ও দাসী হিসেবে অবহেলা করুক, এই দুই পথকেই তারা প্রত্যাখ্যান করে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।

৩। তত্ত্ব নিরপেক্ষ জীবননিষ্ঠ প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার চোরাবালিতে ডুবে যাওয়া নয়, এই লিঙ্গ রাজনীতির নোংরামির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছে নারীচেতনা।

৪। নারীবাদ নারীর যাবতীয় বৌদ্ধিক, শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক অভিব্যক্তি দাবি করেছে।

৫। নারীবাদ চেয়েছে নারীই ঘোষণা করবে তার যাবতীয় চাওয়া, পাওয়ার সমস্ত কথা।

বাংলা সাহিত্যে এই সময়পর্বে যে সমস্ত মহিলা সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের সৃষ্টিতে নারীবাদ গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মহিলা কবিদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন নারীবাদী কবি কবিতা সিংহ।

কবি কবিতা সিংহ তাঁর কবিতায় নিজের নারীত্বের প্রতি যথেষ্ট সচেতনও দৃঢ় মানসিকতার অধিকারী। তাঁর কবিতায় তিনি নারীদের নিজস্ব জগৎ সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়ে, নারীদের জগতে আনলেন এক নতুন ধারা। 'ঈশ্বরকে ইভ' কবিতায় তিনি ঘোষণা করলেন, নারীই প্রথম সেই সাহসী মানুষ, যিনি প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ করে বাইবেল কথিত পবিত্র জ্ঞানবৃক্ষ ছুঁয়েছিল, নিষিদ্ধ লাল আপেল কামড়ে স্বাদ নেওয়ার সাহস জুগিয়েছিল। নারীই তিনি, যিনি প্রথম আকাশ-পাতাল তফাৎ করে দেওয়াল তুলে দেওয়ার স্পর্দ্ধা দেখাতে পেরেছিল। সৃষ্টির গোড়া থেকে সমস্ত নিষিদ্ধতা, সমস্ত নিষেধাজ্ঞার বিপরীতে গিয়ে ছক ভাঙতে শিখিয়েছে নারীই প্রথম। তাঁর আমিত্ব নারীত্বের প্রতি আত্মপ্রত্যয়ী।

কবি কবিতা সিংহ মেয়েদের জন্য কলম ধরলেও তিনি নারীবাদকে স্লোগানের নামান্তর করে তুলতে চাননি। তিনি রূপক নির্ভর বাক্য বিন্যাসে তাঁর নারীবাদকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। 'আছেন ঈশ্বরী' কবিতায় তিনি লিখেছেন, 'কাব্যের ঈশ্বর নেই, আছেন ঈশ্বরী।/তিনি একা তিনি নিরীশ্বর' অর্থাৎ নারী স্বয়ংসম্পূর্ণা। তার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোনো পুরুষের প্রয়োজন হয় না। দেবী সরস্বতী এখানে মিশে গেছেন ঈশ্বর শব্দের সমার্থক রূপে। সৃষ্টির প্রমাণস্বরূপা এই দেবী খ্যাতি ও গরিমা এই দুয়ের অধিকারিণী। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণা, তিনি নারীশক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যাঁর কাছে পুরুষের গরিমা নত হয়ে যায়। এই কবিতায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী শক্তির উত্থানের জন্য তিনি নির্লজ্জ ও নির্মম প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন নারী তার অধিকার বুঝে নিতে তৎপর হয়ে উঠুক প্রতিটি পদক্ষেপে।

ভারতের স্মৃতিশাস্ত্র ও মনুসংহিতায় নারীর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কঠিন বিদ্রোহের সুর গেয়েছেন কবিতা সিংহ। পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায় একদিকে নারীর পায়ে লোহার শিকল পরিয়ে দিয়ে, নারীকে আত্মপ্রকাশের পথে পঙ্গু করে দিয়ে, অন্যদিকে তাকে দেবীর আসনে বসিয়ে প্রকারান্তরে তাকে যে প্রবঞ্চনা করা হয় সেই কঠিন সত্যটি বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন কবিতা সিংহ। তিনি 'অপমানের জন্য ফিরে আসি' কবিতায় লিখছেন, 'আমার অপমানের প্রয়োজন আছে!/... অপমানের জন্য/ফিরে আসি/উচ্চৈঃশ্রবা বিদূষক-সভায়/শাড়ি স্বভাবতই ফুরিয়ে আসে...'। তিনি কবিতার মধ্যে দিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নারী যতদিন নিজেকে

দুর্বল ভাবে, ততদিনই সে দুর্বল, ততদিনই তারা অত্যাচারিত। যেদিন থেকে নারী নিজেকে চিনতে ও বুঝতে শিখবে, সেদিন থেকে নারী হয়ে উঠবে অজেয়।

নারীর প্রতি পুরুষের এই অত্যাচার, অনাচার সমাজের যে কোনো স্তরেই সমান ভাবে দেখা যায়। এই ব্যাধি সমাজের সমস্ত স্তরেই রয়েছে। নিম্নবিত্ত ছাপোষা মানুষ তার স্ত্রীকে যেমন প্রহার করে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করে, তেমনই শিক্ষিত রুচির সভ্য মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বর্বর উচ্চবিত্ত মানুষও বুদ্ধিমত্তার সাথে আর কদর্য মনোভাব প্রকাশ করে। আবার এই শ্রেণির মানুষ অনায়াসে আইনের রঙমাখা খরচ সাজিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। নারী সুবিচারের থেকে দূরেই রয়ে যায়। রাজেশ্বরী নাগমণিকে হত্যা করে তার ডাক্তার স্বামী বিষাক্ত ইঞ্জেকশন দিয়ে। উলঙ্গ অবস্থায় রাজেশ্বরীর লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায় রাস্তায়। তার স্বামী তাকে হত্যা করলেও যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে সেই ডাক্তার অনায়াসে ছাড়া পেয়ে যায়। সমসাময়িক এই ঘটনা কবিতা সিংহের অন্তরকে বিদীর্ণ করেছিল। রাজেশ্বরীর সুবিচার তিনি চেয়েছিলেন। তিনি 'রাজেশ্বরী নাগমণিকে নিবেদিত' কবিতায় তার প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন। তনি রাজেশ্বরীর মতো প্রতিবাদী নারীকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে, তার স্বামী-পুরুষটির সম্পর্কে লিখেছিলেন 'যার নাম হন্তারক, যার নাম হিংস্র পুরুষ।' এই একটিমাত্র লাইন থেকেই কবিতা সিংহের ঘৃণার তীব্রতা কতখানি তা অনুভব করতে অসুবিধা হয় না।

যে নারী পুরুষের শিকার হয় কিছু পাবার আশায় ও জলাঞ্জলি যায় তার নারীত্ব, মাতৃত্ব—তাদের গভীর নিন্দা করেছেন কবিতা সিংহ। বিতৃষ্ণার অপমানে এক নিদারুণ যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে ওঠে তাঁর গলার কাছে। কবিতা সিংহের 'সহজ সুন্দরী', 'কবিতা পরমেশ্বরী' ও 'হরিণা বৈরী' এই তিন কাব্যগ্রন্থেই দেখা গেছে কবির পরিশীলিত অনুভব, বোধ, বুদ্ধি,. জিজ্ঞাসা যেন পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সংগ্রামী হয়ে উঠেছে, আর সেই ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্র মাঝে তিনি যন্ত্রণাময় বীর সেনানীর মতো লক্ষ্যভেদের আনন্দে তৃপ্তি অনুভব করে চলেছেন মর্মে মর্মে। কবিতা সিংহের কবিতায় প্রতিবাদ পুষ্ট হয়েছে নারীবাদের সংস্পর্শে। তাঁর প্রতিবাদের ধাঁচটি সম্পূর্ণ আলাদা, এরমধ্যে স্লোগানের মতো উচ্চকিত স্বর নেই। কবিতা সিংহ চেয়েছিলেন পরিশীলিত, পরিমার্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত আঘাত হেনে পুরুষতন্ত্রের বটবৃক্ষের শিকড় উপড়ে ফেলে দিতে। তিনি চেয়েছিলেন এক্ষেত্রেও নারী হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সক্ষম ও স্বয়ংসিদ্ধ। কবিতা সিংহ বাংলা নারীবাদী কবিতার অগ্রদূত। তার দেখানো পথেই পরবর্তীকালে কবি কৃষ্ণা বসু, কবি নমিতা চৌধুরী, কবি অনুরাধা মহাপাত্র, কবি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, কবি যশোধরা রায়চৌধুরীর মতো বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে।